# শিশু নির্যাতন থামুক, মানবতা জাগুক

মোঃ খালিদ হাসান

শিশুরা একটি জাতির ভবিষ্যৎ, মানবসম্পদের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ এবং আগামী দিনের নেতৃত্বের সম্ভাবনাময় ভিত্তি। তাদের নিরাপদ, সুরক্ষিত ও আনন্দময় শৈশব নিশ্চিত করা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজও বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন ধরনের শিশু নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বিদ্যমান। শিশু নির্যাতন বলতে এমন কোনো আচরণ, কার্যকলাপ বা অবহেলাকে বোঝায় যা একটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আবেগিক বা সামাজিক বিকাশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং তার নিরাপত্তা, মর্যাদা ও মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে।

শিশু নির্যাতনের অন্যতম রূপ হলো শারীরিক নির্যাতন। কোনো শিশুকে আঘাত করা, মারধর করা, থাপ্পড় দেওয়া, লাথি মারা, পুড়িয়ে দেওয়া কিংবা শাস্তির নামে শারীরিক কষ্ট দেওয়া শারীরিক নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময় অভিভাবক বা শিক্ষক শাসনের নামে এমন আচরণকে স্বাভাবিক মনে করলেও তা শিশুর অধিকার লঙ্ঘন করে এবং তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।মানসিক বা আবেগিক নির্যাতন এমন আচরণকে বোঝায় যা শিশুর আত্মসম্মানবোধ, আত্মবিশ্বাস ও মানসিক সুস্থতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। নিয়মিত অপমান করা, ভয়ভীতি দেখানো, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, গালিগালাজ করা, অন্যের সঙ্গে তুলনা করে হেয় করা কিংবা ভালোবাসা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত করা মানসিক নির্যাতনের উদাহরণ। যৌন নির্যাতন শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সবচেয়ে গুরুতর অপরাধগুলোর একটি। এ ধরনের নির্যাতন শিশুর শারীরিক নিরাপত্তার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও শিশু নির্যাতন এখনো একটি বড়ো সামাজিক উদ্বেগের বিষয়। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, জনপরিসর এমনকি ডিজিটাল মাধ্যমেও শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা, শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। শারীরিক শাস্তি, মানসিক নিপীড়ন, যৌন সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম এবং অনলাইন হয়রানির মতো ঘটনাগুলো শিশুদের নিরাপদ শৈশবকে হুমকির মুখে ফেলছে। শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থা ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলো ইঙ্গিত করে যে নির্যাতনের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশিত ঘটনার তুলনায় অনেক বেশি, কারণ সামাজিক লজ্জা, ভয় এবং বিচারহীনতার আশঙ্কায় অনেক ঘটনা সামনে আসে না।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান পরিস্থিতির উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে প্রায় ৯ জন প্রতি মাসে কোনো না কোনো ধরনের পারিবারিক সহিংসতা বা কঠোর শাসনের মুখোমুখি হয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০শে মে পর্যন্ত মাত্র চার মাসেই কমপক্ষে ১১৮ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আর ধর্ষণ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার কমপক্ষে ১৭ শিশু।

পরিবার একটি শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষালয়। শিশুর ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ, আচরণ ও মানসিক বিকাশের ভিত্তি গড়ে ওঠে পারিবারিক পরিবেশে। তাই পরিবারে নিরাপত্তা, স্নেহ ও সহমর্মিতার পরিবেশ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পরিবারই শিশু নির্যাতনের অন্যতম উৎসে পরিণত হয়। অভিভাবকদের অসচেতনতা, রাগ, মানসিক চাপ, অর্থনৈতিক সংকট কিংবা ভুল শাসন-পদ্ধতির কারণে শিশুরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। এসব নির্যাতনের প্রভাব শিশুর মনোজগতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে এবং তার স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক সমাজে এখনো শাসনের নামে শিশুদের মারধর করা, ভয়ভীতি দেখানো বা অপমান করাকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। অনেক অভিভাবক বিশ্বাস করেন যে কঠোর শাস্তি শিশুদের শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তোলে। বাস্তবে এর ফল হয় উল্টো। থাপ্পড় দেওয়া, বেত্রাঘাত করা, কান মলা, দাঁড়িয়ে রাখা কিংবা গালিগালাজ করার মতো আচরণ শিশুর মধ্যে ভয়, ক্ষোভ ও আত্মবিশ্বাসহীনতা তৈরি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শারীরিক শাস্তি শিশুর আচরণগত সমস্যা, মানসিক চাপ এবং আক্রমণাত্মক প্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। ইতিবাচক শাসন, ধৈর্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে শিশুকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই অধিক কার্যকর ও মানবিক পদ্ধতি।

পারিবারিক কলহও শিশুদের ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাবা-মায়ের মধ্যে নিয়মিত ঝগড়া, সহিংস আচরণ, পারস্পরিক অবিশ্বাস কিংবা বিচ্ছেদের দ্বন্দ্ব শিশুদের মানসিক নিরাপত্তাবোধ নষ্ট করে দেয়। এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুরা প্রায়ই উদ্বেগ, হতাশা, ভয় এবং একাকিত্বে ভোগে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যায়, সামাজিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আচরণে পরিবর্তন দেখা দেয়। কিছু শিশু নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়, আবার কেউ কেউ আক্রমণাত্মক আচরণ প্রদর্শন করে। পারিবারিক সহিংসতা ও কলহের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আরও গভীর হতে পারে। শৈশবে সহিংস পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুদের একটি অংশ ভবিষ্যতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আস্থাহীনতা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং সামাজিক অভিযোজনের জটিলতায় ভুগতে পারে। ফলে একটি পরিবারের অস্থিরতা শুধু একটি শিশুর বর্তমানকেই নয়, তার ভবিষ্যৎ জীবনকেও প্রভাবিত করে ।

নির্যাতনের শিকার শিশুর সবচেয়ে বড়ো প্রভাব হলো মানসিক ট্রমা। নির্যাতনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শিশুর মনে স্থায়ী ভয়, উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি করে। তারা প্রায়ই দুঃস্বপ্ন, অতিরিক্ত আতঙ্ক, একাকিত্ব এবং হতাশায় ভোগে। অনেক শিশু নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং আত্মসম্মানবোধ কমে যায়। কিছু ক্ষেত্রে গুরুতর মানসিক সমস্যার কারণে তাদের আচরণে আক্রমণাত্মকতা বা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান আইন হলো শিশু আইন, ২০১৩। এই আইনে শিশুর সংজ্ঞা নির্ধারণ, বিচার প্রক্রিয়ায় শিশুদের বিশেষ সুরক্ষা, এবং অপরাধপ্রবণ শিশুদের সংশোধনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, শিশুদের কারাগারে প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে রাখা যাবে না এবং তাদের পুনর্বাসনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি শিশুদের অধিকার রক্ষায় একটি মানবিক ও আধুনিক আইনগত কাঠামো তৈরি করেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন হলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত)। এই আইনের মাধ্যমে ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, পাচার, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে বাস্তবে আইন প্রয়োগ ও বিচার প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে।

সরকার শিশু সুরক্ষায় বিভিন্ন সুরক্ষামূলক কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করছে। যেমন—শিশু সুরক্ষা নীতি, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ কর্মসূচি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

কর্মসূচি। এছাড়া হেল্পলাইন ১০৯৮-এর মাধ্যমে নির্যাতিত শিশুদের জরুরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন এনজিও ও উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে শিশুদের পুনর্বাসন ও সুরক্ষার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। তথাপি, শুধু আইন ও কর্মসূচি যথেষ্ট নয়; এর কার্যকর বাস্তবায়নই মূল চ্যালেঞ্জ। সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিশু অধিকার বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করা সম্ভব। একটি কার্যকর ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য শিশু সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য।

পরিবারে ভালোবাসা, বিদ্যালয়ে সুরক্ষা, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল জগতে সচেতনতা—এই চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়েই গড়ে উঠতে পারে একটি নিরাপদ শিশু-সমাজ। প্রতিটি অভিভাবক, শিক্ষক, প্রতিবেশী এবং নাগরিক যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল হন, তবে শিশু নির্যাতনের ভয়াবহতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। শিশুবান্ধব সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। শাসনের নামে সহিংসতা নয়, বরং ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে শিশুকে গড়ে তোলা উচিত। শিশুদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের স্বপ্নকে সম্মান জানানোই একটি উন্নত সমাজের পরিচায়ক। রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন যতই শক্তিশালী হোক না কেন, নাগরিকদের মানবিক চেতনা ছাড়া প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব নয়।

#

লেখকঃ সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার